গবেষণা সিরিজ-২৮

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউ ডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Website: revivedislam.com
E-mail- qrf.1001@gmail.com

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৫.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস	৭
৩.	সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে	১৫
৪.	মূল বিষয়	১৭
৫.	শিরকের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ	১৭
৬.	ইসলামে মিথ্যা কথা বা কাজের সংজ্ঞা	২০
৭.	শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য	২২
৮.	শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য	২৪
৯.	শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের তথ্য	৩৮
১০.	শেষ কথা	৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে

পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন

জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক

করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২,নিসা : ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০১.০৯.২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত

পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির

মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا–

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেকে নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِـــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা

ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।
(বুখারী ও মুসলিম)
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।
(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে—

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer

disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল—

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

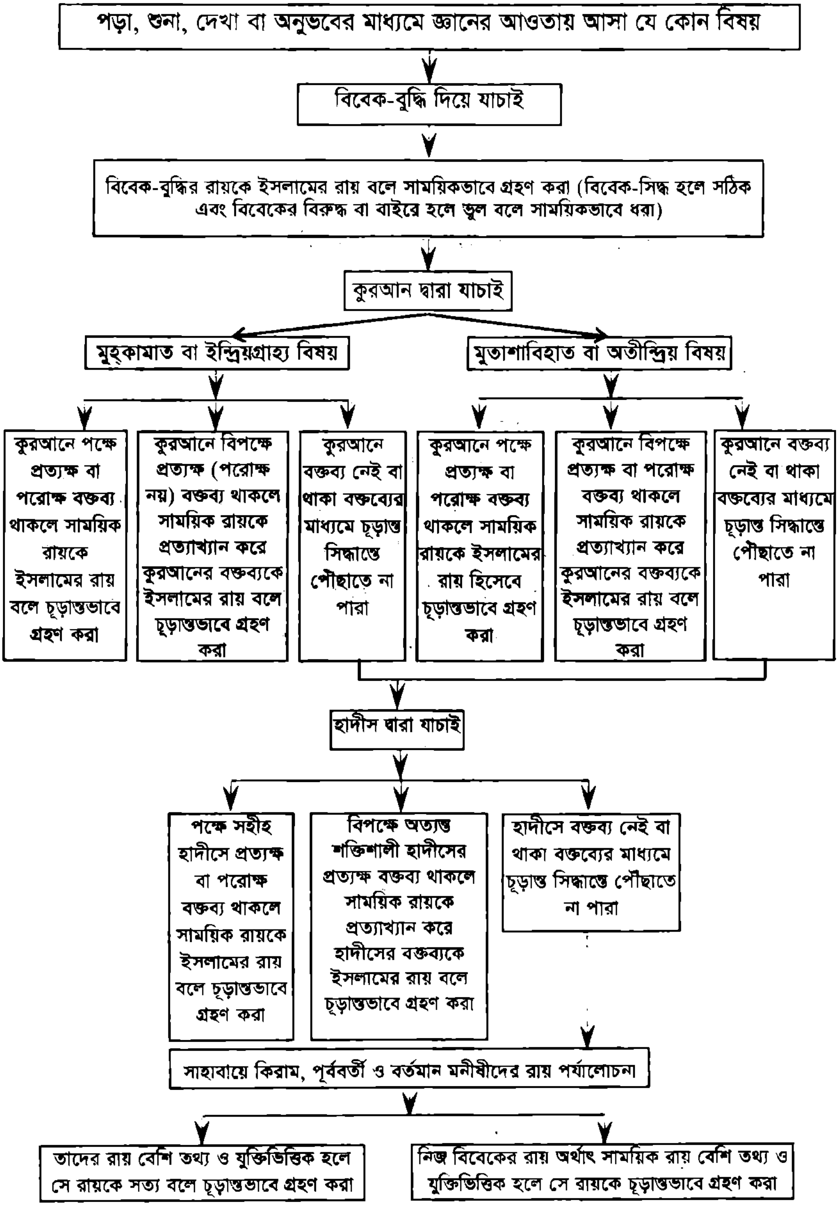

মূল বিষয়

সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি এ তথ্যটি একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম জানা দরকার। কারণ এটি নিশ্চিত যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ থেকে মুক্ত না থাকতে পারলে একজন মুসলমানের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান জানে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল 'শিরক করা'। তথ্যটি জানা থাকলেও শিরক কাকে বলে, কয় প্রকার ও কি কি এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ সাধারণ মুসলমানের ধারণা অনেক কম। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে কিনা তা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা। আর এ পর্যালোচনায় যদি প্রতীয়মান হয় যে তথ্যটি সঠিক নয় তবে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি তাও উদঘাটন করা। আর এর মাধ্যমে জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের অপরিসীম অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করে সফলতার দিকে ব্যাপকভাবে অগ্রসর করে দেয়া।

শিরকের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় বুঝতে হলে প্রথমে শিরক কাকে বলে এবং শিরকের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা থাকা বিশেষভাবে দরকার। তাই প্রথমে চলুন এ বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেয়া যাক।

শিরকের সংজ্ঞা

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে এ কথা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বুঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

শিরকের শ্রেণীবিভাগ

১.আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

এটি হচ্ছে আল্লাহ্ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা। মুসলমানরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত বলা চলে।

২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক

এটি হচ্ছে, যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা। যেমন- সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার এই রকম গুণ আছে, এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। চাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোন নবী-রাসূল (আ.), অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমানকালের মুসলমানদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে- এ কথা স্বীকার করলে শিরক করা হবে। যেমন, সেজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোন মাজারে বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করল। এ ধরনের শিরক মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত-মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেয়া এবং গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর নিকট থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি মনে করে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার, আল্লাহর নিকট থেকে জোর করে বা আল্লাহকে বাধ্য করে অথবা ইচ্ছে করলেই আল্লাহকে অনুরোধ করে ঐ গুলো আদায় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে। মানুষ ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পিছনে অর্থ-সম্পদ বা শ্রম তখনই শুধু ব্যয় করে যখন সে মোটামুটি নিশ্চিত হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা সত্তার নিকট থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। তদ্রুপ, আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ

ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর নিকট থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমানে মুসলমান সমাজে এই ধরনের শিরক কম-বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ

অর্থ : হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এই আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন যে, হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোন সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট আইন দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া কোন স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা সব চেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সব ক'টিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলমান সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলমান খুশি মনে

মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। আর রাসূল (সা.) সেগুলো বাস্তবে রূপদান করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থী কোন আইন বানানোর ক্ষমতা কোন সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার (কুফরীর) সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে খারাপ পর্যায়। আর যে সব মুসলমান ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে, তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

ইসলামে মিথ্যা কথা বা কাজের সংজ্ঞা

ইসলামে সত্যের বিপরীত যেকোন কথা বা কাজকে মিথ্যা বলে। চাই সে কথা বা কাজ জেনে বলা বা করা হোক অথবা না জেনে বলা বা করা হোক, অন্যদিকে ইসলামে সত্যের মূল উৎস হলো মহান আল্লাহ। তাই আল্লাহ তায়ালার বলা যে কোন বিষয়ের বিপরীত কথা বা কাজ ইসলামে মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তায়ালার কথা নির্ভুলভাবে লেখা আছে আল-কুরআনে। তাই আল-কুরআনে উল্লেখ থাকা যে কোন বিষয়ের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা মিথ্যা বলে গন্য হবে। চাই তা জেনে বা না জেনে বলা বা করা হোক। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ মানুষের জীবনের সকল দিকের মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি উল্লেখ করে রেখেছেন মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যেমন কুরআনে আল্লাহ-

১. কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন
২. ঈমান আনতে বলেছেন
৩. শিরক করতে নিষেধ করেছেন

৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করেছেন
৬. মিথ্যা প্রচার করতে নিষেধ করেছেন
৭. বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে বলেছেন
৮. অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন
৯. দ্বীন কায়েম করতে বলেছে
১০. সালাত কায়েম করতে, যাকাত আদায় করতে, রোজা থাকতে এবং হজ্ব করতে বলেছেন
১১. মানব কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করতে বলেছেন
১২. মা বাবাকে 'উফ' বলতেও নিষেধ করেছেন
১৩. এতিমকে ফাঁকি দিতে নিষেধ করেছেন
১৪. আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন প্রমুখের সাথে সদাচরন করতে বলেছেন
১৫. মাপে কম দিতে নিষেধ করেছেন
১৬. ন্যায়বিচার করতে বলেছেন
১৭. হারাম বস্তু খেতে নিষেধ করেছেন
১৮. সুদ ও ঘুষ খেতে নিষেধ করেছেন
১৯. চুরি করতে নিষেধ করেছেন
২০. ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেদ করেছেন
২১. কাউকে অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন
২২. যিনা করতে নিষেধ করেছেন
২৩. পর্দা রক্ষা করে চলতে বলেছেন
২৪. অন্যায়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন
২৫. একজন নিরীহ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমগ্র মানব সভ্যতাকে হত্যা করার সমান বলে উল্লেখ করেছেন
২৬. একজন মানুষকে বাচানো সমগ্র মানবসভ্যতাকে বাচানোর সমান বলে উল্লেখ করেছেন।
২৭. অহংকার করতে নিষেধ করেছেন
২৮. গীবত / চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন
২৯. অপব্যয়-অপচয় করতে নিষেধ করেছেন

৩০. দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে বলেছেন
৩১. দলবদ্ধভাবে চলতে বলেছেন
৩২. দলাদলি করতে নিষেধ করেছেন
৩৩. মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করেছেন
৩৪. সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন
৩৫. শত্রুদের জন্যে যুগোপযোগী মান ও পরিমাণের সমর শক্তি প্রস্তুত করে রাখতে বলেছেন
৩৬. মিথ্যা তথ্য প্রচার করাকে হত্যার চেয়ে বড় অপরাধ বলেছেন
৩৭. এ ছাড়া মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে উল্লেখ করে রেখেছেন

আল-কুরআনে উল্লেখ থাকা এ সকল বিষয়ের যে কোনটির বিপরীত কথা বা কাজ ইসলামে মিথ্যা বলে গন্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ সকল বিষয়ের বিপরীত কথা বলবে বা কাজ করবে সে মিথ্যা রচনাকারী বলে গন্য হবে। তাই শিরক করা ব্যক্তি যেমন মিথ্যা বলা বা মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তি বলে গন্য হবে তেমনি উপরে উল্লেখিত যেকোন একটি বিষয়ের বিপরীত কথা বা কাজ যে বলবে বা করবে সেও মিথ্যা বলা বা মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তি বলে গন্য হবে।

শিরকের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ এবং ইসলামে মিথ্যা কথা বা কাজের বিষয়ে উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ সামনে রেখে চলুন এখন শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের তথ্যসমুহ পর্যালোচনা করা যাক।

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির তথ্য

তথ্য-১

গুনাহ অর্থ অপরাধ। শিরক হল ইসলামের একটি নিষিদ্ধ কাজ। অর্থাৎ শিরক করা ইসলামের একটি অপরাধের কাজ। ইসলামে শিরক ভিন্ন আরো অনেক অপরাধের কাজ আছে। বিবেক-বুদ্ধি তথা যুক্তি অনুযায়ী

কোন বিষয়ের বিশেষ একটি নিষিদ্ধ কাজ করা সবচেয়ে বড় অপরাধ হবে না বরং সবচেয়ে বড় অপরাধ হবে নির্ভুল উৎস থেকে ঐ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন না করা। কারণ নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন না করলে ঐ বিশেষ নিষিদ্ধ কাজটিসহ আরো অনেক কাজ যে নিষিদ্ধ আছে তা সে জানতেই পারবেনা। ফলে সে ঐ বিশেষ নিষিদ্ধ কাজসহ আরো অনেক নিষিদ্ধ কাজ করে যেতে থাকবে। আর তাতে তার নিজের বা অন্য মানুষের ঐ বিশেষ নিষিদ্ধ কাজের ক্ষতিসহ আরো অনেক ক্ষতি হবে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। ডাক্তারী বিদ্যায় অনেক নিষিদ্ধ কাজ আছে। ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করা ডাক্তারী বিদ্যায় অপরাধ। ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলোর বিশেষ একটি করা ডাক্তারী বিদ্যা অনুযায়ী অবশ্যই বিশেষ অপরাধের কাজ। কিন্তু তা ডাক্তারী বিদ্যার সবচেয়ে বড় অপরাধ নয়। ডাক্তারী বিদ্যায় সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো সর্বাধিক নির্ভুল গ্রন্থ থেকে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন না করে ডাক্তারী করা। কারণ ঐ ডাক্তার(!) না জানার কারণে ঐ বিশেষ নিষিদ্ধ কাজটিসহ আরো অনেক নিষিদ্ধ কাজ করে যেতে থাকবে। আর তাতে রোগীদের ঐ বিশেষ নিষিদ্ধ কাজ করার ক্ষতিসহ আরো অনেক ক্ষতি হবে।

ইসলামেও শিরক সহ আরো অনেক নিষিদ্ধ কাজ আছে। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শিরক করা একটি বড় অপরাধ (গুনাহ) হলেও তা সবচেয়ে বড় অপরাধ (সবচেয়ে বড় গুনাহ) হওয়ার কথা নয়। বরং ইসলামে সবচেয়ে বড় অপরাধ হওয়ার কথা ইসলামের একমাত্র নির্ভুল উৎস কুরআনের জ্ঞান না থাকা। কারণ যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ আরো অনেক বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) করে যেতে থাকবে কিন্তু সে তা বুঝতেও পারবে না। আর এভাবে সে নিজের ও সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে যেতে থাকবে।

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্য

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে কিনা এ বিষয়ে আল-কুরআনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সব সময় সামনে রাখতে হবে। বিষয় দুটি হলো-

১. আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা, বক্তব্য বা তথ্য নেই। এটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে।
২. কুরআনের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয়ে বা ঐ তথ্য ধারনকারী যত আয়াত আছে সেগুলোকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। ঐ পর্যালোচনার সময় একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখা অন্য আয়াতের সম্পূরক হতে হবে। বিরোধী হলে চলবে না।

চলুন এখন এ দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে সামনে রেখে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে কিনা এ বিষয়ে কুরআনের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

তথ্য-১.১

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক অতিবড় যুলুম। (লোকমান/৩১: ১৩)

ব্যাখ্যা: শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে যারা বিশ্বাস করেন তাঁদের অধিকাংশ সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতের এ অংশটুকুকে ঐ তথ্যের দলিল হিসেবে জানেন। তাই চলুন তাফসীরের নীতিমালা (উসূলে তাফসীর) অনুযায়ী এ আয়াতাংশ হতে ঐ তথ্য পাওয়া যায় কিনা বা কি তথ্য পাওয়া যায় তা একটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

প্রথমে এ আয়াতাংশে মহান আল্লাহ কি বলেছেন তা পর্যালোচানা করা যাক। এখানে আল্লাহ বলেছেন 'নিশ্চয় শিরক অতিবড় যুলুম'। যুলুম অর্থ অত্যাচার, অপরাধ বা গুনাহ। তাহলে এখানে আল্লাহ নিশ্চয়তা সহকারে বলেছেন শিরক অতিবড় গুনাহ। অর্থাৎ যে শিরক করে সে অতিবড় যুলমকারী বা গুনাহগার ব্যাক্তি।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহ এখানে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম তথা সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেননি। বলেছেন অতিবড় যুলুম বা গুনাহ। তাই এ আয়াতাংশ থেকে শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম বা গুনাহ অথবা শিরককারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যুলুমকারী বা সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু অবাক কান্ড হল অধিকাংশ মুসলমান এ আয়াতাংশের বক্তব্যকেই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার দলিল হিসেবে জানে। শয়তানের ধোঁকাবাজি কত মারাত্মক তা এখান থেকেও বুঝা যায়।

তথ্য-১.২

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيْمًا.

অর্থ : এবং যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো সে অতিবড় মিথ্যা রচনা করল। (নিসা / ৪ : ৪৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সাথে শিরক করল সে অতিবড় মিথ্যা রচনা করল। শিরক করাকে মিথ্যা রচনা করা বলে উল্লেখ করার কারণ হলো শিরক করার অর্থ কুরআনে উল্লেখ থাকা একটি বিষয়ের বিপরীত কাজ করা। আর শিরক করায় গুনাহ হওয়ার কারণ হল এর মাধ্যমে মিথ্যা কাজ করা হয় বা মিথ্যা কথা বলা হয়। আর ১.১ তথ্যে শিরক করা ব্যক্তিকে অতিবড় যুলুমকারী ব্যক্তি বলে উল্লেখ করার কারণ হলো সে একজন অতিবড় মিথ্যা রচনাকারী ব্যক্তি।

তথ্য-১.৩

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

অর্থ : (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে সেই কথাকে বহন করছিলে এবং নিজেদের জিহ্বা দ্বারা এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা ওটাকে সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট তা একটি গুরুতর (عظيم) বিষয় ছিল। ঐ কথা শুনেই তোমরা কেন বললে না, 'এ ধরনের

কথা মুখে মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। ত্রুটি মুক্ত থাকা শুধু তোমার গুণ হে আল্লাহ। এটিতো এক বিরাট (عَظِيْمٌ) মিথ্যা দোষারোপ'।

(নূর / ২৪ : ১৫-১৬)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য আয়াতখানিতে বনী মুস্তালিক যুদ্ধের পর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও কিছু সাহাবীদের দ্বারা আয়েশা (রা.) সম্বন্ধে যে মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন। প্রথমে আল্লাহ ঐ রটনাকে একটি عَظِيْمٌ বিষয় তথা গুরুতর বিষয় বলেছেন। তারপর আল্লাহ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন তারা শুনেই (শুনামাত্রই) ঐ বিষয়টাকে কেন একটা بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ বিরাট মিথ্যা দোষারোপ বললো না।

১.১ নং তথ্যে আল্লাহ শিরককে ظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ অতিবড় বা গুরুতর জুলুম (অত্যাচার বা গুনাহ) বলেছেন। আর ১.২ নং তথ্যে শিরক করাকে আল্লাহ إِثْمٌ عَظِيْمٌ তথা অতিবড় বা গুরুতর মিথ্যা (গুনাহ) বলেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, عَظِيْمٌ শব্দটি আল-কুরআনে কোন অপরাধের অতিবড় অবস্থা বুঝানো হয়েছে, সবচেয়ে বড় অবস্থা বুঝানো হয়নি।

অন্যদিকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ আয়েশা (রা.) এর উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে অতিবড় মিথ্যা দোষারোপ এবং অতিবড় গুনাহের বিষয় বলেছেন। এখান থেকে তাহলে সহজে বলা যায়, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা অর্থাৎ না জেনে বা জেনে কুরআনের বিপরীত কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা দোষারোপ বা সবচেয়ে বড় অপরাধ (গুনাহ) বলে গণ্য হওয়ার কথা।

তথ্য ১.৪

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থঃ তাহলে সে ব্যাক্তির চেয়ে অধিক জালিম (অত্যাচারী, অপরাধী বা গুনাহগার) আর কে হতে পারে যে (সঠিক) জ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) না জেনে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে যেন মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়। (আনআম / ৬: ১৪৪)

ব্যাখ্যা: পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা অর্থ হলো কুরআনে উল্লিখিত যেকোন বিষয়ের বিপরীত কথা বলা বা প্রচার করা। আর কুরআনের বিপরীত কথা একজন ব্যক্তি কুরআন না জানার কারণে বলতে পারে আবার কুরআন জানার পরও বলতে পারে তবে যে কুরআন জানে না সে কুরআনের বিপরীত কথা বেশি বলবে। কারণ সে বুঝতে পারবেনা যে সে কুরআনের বিপরীত বলছে।

তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় যালিম তথা সবচেয়ে বড় গুনাহগার বলেছেন যে সঠিক জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআনের বিপরীত কথা বলে বা প্রচার করে। আর ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার বলার কারণ হলো কুরআন না জানার কারণে সে শিরকসহ আরো অনেক বিষয়ে কুরআনের বিপরীত কথাকে সঠিক কথা বলে প্রচার করবে। এর ফলে সে নিজে এবং আরো অসংখ্য মানুষ শিরক সহ আরো অনেক বিষয়ে কুরআনের বিপরীত কাজ করে ক্ষতিগ্রস্থ বা গুনাহগার হতে থাকবে।

তথ্য ১.৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

অর্থ: সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে। অথবা সত্য (কুরআনের তথ্য) তার নিকট পৌঁছার পরও সে ঐ সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করে।

(আনকাবুত / ২৯: ৬৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে মানুষের দুটি অবস্থাকে সবচেয়ে বড় যুলুম বা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম অবস্থাটিকে আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করা তথা কুরআনের বিপরীত কথা রচনা করা বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় অবস্থাটিকে সত্য তার নিকট পৌঁছার পর অর্থাৎ কুরআন জানার পরও কুরআনের তথ্য সম্বন্ধে বিপরীত কথা প্রচার করা বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সহজে বুঝা যায় প্রথম অবস্থাটি হবে কুরআন না জেনে কুরআনের বিপরীত কথা বলা বা প্রচার করা।

জানার পর কুরআনের বিপরীত বলার চেয়ে না জানার কারণে কুরআনের বিপরীত বলা বেশী গুনাহ। কারণ-

১. যে ব্যক্তি জানার পর বিপরীত বলে তার জানার ফরজটি আদায় হয় কিন্তু বিপরীত বলার জন্য বড় গুনাহ হয়।
২. যে জানে তার ভবিষ্যতে একদিন সঠিক কথাটি বলতে পারার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে জানে না সেতো কোনদিনও সঠিক কথাটি বলতে পারবে না।
৩. জানার পর বিপরীত বলা বেশী গুনাহ কথাটি মানুষকে জ্ঞান অর্জনের থেকে দূরে সরায় । আর না জানার কারনে বিপরীত বলায় বেশী গুনাহ তথ্যটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করে।

তাই সহজেই বলা যায় মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন না জানার কারনে কুরআনের বিপরীত (মিথ্যা) কথা বলা বা প্রচার করা সবচেয়ে বড় জুলুম, অত্যাচার, অপরাধ বা গুনাহ।

তথ্য-১.৬

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

অর্থ: তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সে উহা হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। (সাজদা/৩২:২২)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় যুলুমকারী বা গুনাহগার বলেছেন যে কুরআনের বক্তব্য শুনা তথা জানার পরও তা হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কুরআনের বক্তব্য জানার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার অর্থ হলো সে অনুযায়ী আমল না করা। অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য জানার পর সে অনুযায়ী আমল না করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার বলেছেন। তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন না জানার কারণে কুরআন অনুযায়ী আমল করতে পারে না সে আরো বড় গুনাহগার হবে। কারণ সে না জানার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত শিরকসহ নানা ধরনের কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত কাজ করে যেতে থাকবে।

তথ্য-১.৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

অর্থ: তার চেয়ে বড় জুলুমকারী আর কে হতে পারে যার নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে কোন স্বাক্ষ্য বর্তমান আছে কিন্তু সে তা গোপন করে।

(বাকারা /২ : ১৪০)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর পক্ষ হতে স্বাক্ষ্য কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া কোন তথ্য তথা আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ থাকা কোন তথ্য। আল-কুরআন হলো আল্লাহর পাঠানো সর্বশেষ কিতাব।

তাহলে মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যারা কুরআন সহ আল্লাহর পাঠানো যে কোন কিতাবের তথ্য গোপন করে তার চেয়ে বড় জুলুমকারী আর কেউ নেই। অর্থাৎ যে কুরআনের তথ্য গোপন করে সে সবচেয়ে বড় যুলুমকারী বা গুনাহগার।

কুরআনের তথ্য গোপন করা গুনাহ। আবার জানার পর কুরআনের তথ্য গোপন করার চেয়ে না জানার কারনে গোপন করায় বেশি গুনাহ। তাই এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমেও মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-১.৮

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

অর্থ : বল যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (মূর্খ) তারা কি কখনও সমান হতে পারে? (যুমার / ৩৯ : ০৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা জানে আর যারা জানে না তারা গুনাহ করা সহ কোনদিক দিয়ে সমান হতে পারে না। অর্থাৎ এ আয়াতাংশের একটি শিক্ষা হল যে জানে সে শিরক সহ অন্য গুনাহ অনেক কম করবে। আর যে জানে না সে শিরক সহ অন্য গুনাহ অনেক বেশী করবে।

মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ২নং আয়াতে 'এ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই', আর একই সূরার ১৮৬ নং আয়াতে কুরআন 'সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী' তথ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন নির্ভুল গ্রন্থ। আর বাস্তবে কুরআন হল পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।

তাই আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় যে, যার কুরআনের জ্ঞান আছে সে শিরকসহ অন্য গুনাহ করবে না বা খুবই কম করবে। আর যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ অন্য অনেক গুনাহ করে যেতেই থাকবে।

সুতরাং এ আয়াতের আলোকে অতি সহজে বলা যায়, শিরক করার চেয়ে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অনেক বড় গুনাহ। অন্য কথায় কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-১.৯

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ؟

অর্থ : বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করনা? (আন্'আম / ৬ : ৫০)

ব্যাখ্যা : 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমানে হতে পারে?'-এ প্রশ্নটি আল্লাহ্ আল-কুরআনের অনেক জায়গায় করেছেন। এ প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ্ জানতে চেয়েছেন যারা জ্ঞান থাকার কারণে দেখে আর যারা জ্ঞান না থাকার কারণে দেখতে পায় না তারা কখনও সমান হতে পারে কিনা। প্রশ্নটির চিরসত্য উত্তর হবে ঐ ধরনের ব্যাক্তিরা শিরক করা সহ কোন দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারে না।

তাই ১.৮ নং তথ্যের ন্যায় এ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও বলা যায় আল্লাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন শিরক নয়, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

আয়াতের শেষে 'তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করোনা?'- কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষকে তিরষ্কার করেছেন। অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কোন দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারে না। এ বিষয়টি এবং এ তথ্যটি ব্যাখ্যা করে শিরক নয় বরং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ বিষয়টি বুঝা অত্যন্ত সহজ। তাই আল্লাহ্ এখানে মানুষকে তিরষ্কার করেছেন এ কারণে যে, যে মানুষকে তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করেছেন সেই মানুষ এত সহজ একটি বিষয় কেন বুঝতে পারবে না? অর্থাৎ বলা যায় শিরক নয় বরং কুরআনের জ্ঞান না থাকা

সবচেয়ে বড় গুনাহ, এ বিষয়টি যারা বুঝতে বা মানতে পারবেনা তাদেরকে আল্লাহর তিরষ্কারের সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্য-১.১০

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۝

অর্থ : যখন তোমরা কুরআন পড়বে (পড়া আরম্ভ করবে) তখন অভিশপ্ত শয়তানের (ধোঁকাবাজি) থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে।

(নাহল / ১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ নামাজ, রোজা বা অন্য কোন কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে সাহায্য বা আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তাই জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া আরম্ভ করার আগে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে। আল্লাহ তাঁর এই কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন নামাজ, রোজা ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ যা হবে সেটিই যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে, এটি বুঝা সহজ। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

❑❑ আল-কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধির এ সকল তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, ইসলামে শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ নয়। কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-২.১

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করেন না। আর উহা ভিন্ন যাকে ইচ্ছা করেন মাফ করে দেন। (নিসা/৪ : ৪৮,১১৬)

অসতর্ক ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে বলেছেন তিনি শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আর শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায় শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

❑❑ যারা শিরককে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে জানেন তাদের অনেকে শুধু এ আয়াতখানির অসতর্ক ব্যাখ্যাকে দলিল হিসেবে জানেন। আর অনেকে ১.১ নং তথ্যের আয়াতখানির সঙ্গে এ আয়াতখানিকেও দলিল হিসেবে জানেন। তাই আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো এ আয়াতে কারীমার প্রকৃত শিক্ষা কী। ঐ ব্যাখ্যার সময়ও মনে রাখতে হবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন এবং কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা, বক্তব্য বা তথ্য নেই।

তথ্য-২.২

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَـٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা জাহালত (অজ্ঞতা, ধোঁকা, লোভ-লালসা ইত্যাদি) এর কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই হল সেসব লোক, যাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন তাওবা (ক্ষমা) নেই, যারা (মুমিন) অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে, আমি এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন তাওবা (ক্ষমা) নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(নিসা / ৪: ১৭,১৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দুখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শিরকসহ সকল গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ

বাদে) তাওবার মাধ্যমে মাফ হবে। তবে ঐ তাওবা গুনাহ করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময়ের পূর্বে করতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যু আসার এতটুকু সময় পূর্বে তাওবা করতে হবে যখন ব্যক্তির একটি গুনাহ করার সুযোগ আসলে নিজ ক্ষমতায় এবং জ্ঞানে ঐ গুনাহ না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থা থাকে।

তথ্য-২.৩

وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا . وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

অর্থ : রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খদের কথা হয়, তখন তারা বলে, সালাম এবং রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত ও দন্ডায়মান হয়ে এবং বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। তাদের

অবস্থান হয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় (দোযখে) লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে ঈমানের পথে ফিরে এসে সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদের গুনাহকে সওয়াবে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর যে তওবা করে, সৎকর্ম শুরু করে দেয়, সে তো ফিরে আসার স্থানের দিকে ফিরে আসে। আর যারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় না এবং যখন বেহুদা ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখন ভদ্রভাবে তা এড়িয়ে যায় এবং যাদেরকে তাদের পালনর্তার আয়াতসমূহ শুনিয়ে নসিহাত করা হলে তখন অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করেনা। (ফুরকান /২৫ : ৬৩-৭৩)

ব্যাখ্যা : রহমানের বান্দা তথা মুমিনদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ আয়াতদুখানির বক্তব্য আরম্ভ করেছেন। আয়াতে কয়েকটি বড় নিষিদ্ধ কাজের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করা'। অর্থাৎ শিরক করা।

আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেছেন যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো তথা শিরকসহ অন্য কবীরা গুনাহগুলো করার পর তাওবা করে, তাদের ঐ সকল গুনাহ শুধু মাফই করা হবে না সওয়াবে পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

তথ্য-২.৪

ইসলামে একটি নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হবে কি হবে না এবং হলে কি ধরনের গুনাহ হবে তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। বিষয় ৩টি হল-

ক. ওজর, বাধ্য-বাধকতা বা কৈফিয়ত
খ. অনুশোচনা
গ. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা

তাই একটি বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে ইসলামে পাঁচ ধরনের অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. কোন গুনাহ হবে না

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের হলে এ ধরনের অবস্থা হবে।

২. ছগীরা গুনাহ হবে

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।

৩. মধ্যম গুনাহ

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের ৫০% (মাঝামাঝি) হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।

৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের তুলনায় প্রায় না থাকার মত হলে এ ধরনের গুনাহ হবে।

৫. কুফরী কবীরা গুনাহ

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা মোটেই না থাকলে এ ধরনের গুনাহ হবে।

~~বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, হাদীস ও**~~ **বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ'** নামক বইটিতে।

তাই ইসলামে শিরক করলে তথা শিরকী কাজ করলে বা কথা বললে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ
২. সাধারণ কবীরা গুনাহ
৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) ধরনের গুনাহ
৪. ছগীরা গুনাহ
৫. কোন গুনাহ নাও হতে পারে

তথ্য-২.৫

ইসলামে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. তাওবা

২. নেক আমল

৩. অন্যের দোয়া

৪. শাফায়াত

৫. আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা

অন্যদিকে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি তথা আল্লাহর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী -

- ❑ তাওবার মাধ্যমে সকল ধরনের গুনাহ মাফ হবে
- ❑ কবীরা গুনাহ তাওবা ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে মাফ হবে না
- ❑ শাফায়াতের মাধ্যমে মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ হবে
- ❑ নেক আমলের মাধ্যমে শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হবে
- ❑ অন্যের দোয়া ও আল্লাহর সরাসরি ইচ্ছায় কবীরা গুনাহ মাফ হবে না। ছগীরা গুনাহ মাফ হবে, মধ্যম গুনাহ হতেও পারে।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহ সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?'** নামক বইটিতে।

তথ্য : ২.৬

আল-কুরআনের যে সকল আয়াতে 'আল্লাহর ইচ্ছায়' কিছু হওয়ার কথা বলা আছে সেগুলোর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায় যে অধিকাংশ স্থানে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা বুঝানো হয়ছে। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বুঝানো হয়নি। কারো অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় তার করা বিধি বিধান, নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। অর্থাৎ কারো তৈরী করে রাখা বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোন কাজ সংঘটিত হলে কাজটি তার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে বলে ধরতে হবে বা ধরা যায়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

২.১ নং তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা :

উল্লিখিত তথ্যসমূহ সামনে রেখে চলুন এখন ২.১ নং তথ্যের ব্যাখ্যা করা যাক। তথ্যটিতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন তিনি তাঁর সাথে শিরক করাকে তথা শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আর উহা ভিন্ন অন্য গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।

প্রথমে আয়াতে কারীমার প্রথম অংশ তথা 'নিশ্চয় আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ্ মাফ করবেন না' অংশের ব্যাখ্যা করা যাক। এ অংশের ব্যাখ্যা যদি এটি করা হয় যে আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ তথা শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা, মধ্যম বা ছগীরা কোন ধরনের গুনাহ্ মাফ করবেন না তবে তা গ্রহনযোগ্য হবে না। কারণ-

ক. সূরা নিসার ১৭ ও ১৮ নং আয়াতের এবং সূরা ফুরকানের ৭৩ ও ৭৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তাওবার মাধ্যমে শিরকের গুনাহ্ শুধু মাফই হবে না, ঐ গুনাহ্ সওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

খ. শিরকের গুনাহ্ যদি আল্লাহ্ মাফ না করেন তাহলে কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহ্ মাফ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্ আরো কঠোর হবেন। কারণ কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ্।

তাই আয়াতেকারীমার এ অংশের সঠিক ব্যাখ্যা হবে-

আল্লাহ্ শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা গুনাহ্ তাওবা ব্যতীত মাফ করবেন না। কারণ এ ব্যাখ্যা অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সাথে সম্পূরক হয়। বিপরীত হয় না।

আয়াতেকারীমার দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে 'আর উহা ব্যতীত অন্যসকল গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন'। আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যা করে যদি এটি বলা হয় যে, 'শিরক ভিন্ন অন্য সকল গুনাহ্ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন' তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন শিরক বা অন্য

যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত 'কবীরা গুনাহ' তাওবা ব্যতীত আল্লাহ মাফ করবেন না।

অন্যদিকে আয়াতেকারীমার এ অংশের ব্যাখ্যা যদি করা হয় 'আল্লাহ শিরক করার মাধ্যমে অর্জিত কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য ধরনের গুনাহ (মধ্যম বা ছগীরা গুনাহ) তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী মাফ করে দিবেন, তবে সে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ ব্যাখ্যা কোন আয়াতের বিরোধী হবে না।

❑❑ সুতরাং আল কুরআন অনুযায়ী সূরা নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াত

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

এর প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে-
নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ করবেন না। আর শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য গুনাহ তথা শিরক সম্পর্কিত মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ, তাঁর অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে যে মাফ পাওয়ার যোগ্য হবে তাকে মাফ করে দিবেন।

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের তথ্য

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে কিনা এ বিষয়ে হাদীসের তথ্য পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে-

১. রাসূল (সা.) কুরআনের অতিরিক্ত কথা বলতে পারেন তবে কুরআনের বিপরীত কথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা রাসূল (সা.) এর হাদীস হতে পারে না।
২. হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার সময় ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।
৩. কুরআনের তথ্যের সাথে সংগতিশীল হাদীস ঐ বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।
৪. শক্তিশালী হাদীস একই বিষয়ের অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত হাদীসকে রহিত করে।

এ তথ্য সমূহ সামনে রেখে চলুন এখন আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করা যাক।

তথ্য-১.১

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (ر) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) خَيْرُكُمْ مَنْ تعَلَّمِ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه'-

অর্থ : উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিখায়।' (বুখারী)

ব্যাখ্যা : এখানে রাসূল (সা.) বলেছেন যার কুরআনের জ্ঞান আছে এবং অপরকে তা শিখায় সে হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি তথা সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি। তাহলে এ হাদীস থেকে বলা যায় যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে সবচেয়ে অধম তথা সবচেয়ে গুনাহগার ব্যক্তি। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-১.২

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص)اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ-

অর্থ : রাসূল (সা.) বলেছেন, কুরআন তেলাওয়াত করা (কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা) সর্বোত্তম ইবাদত। (কানযুল ওম্মান)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস বলছে, কুরআন তেলাওয়াত করা তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সর্বোত্তম ইবাদত। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ। তাহলে এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য : ১.৩

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِيْ رَسُوْلِ اللهِ (ص) رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه' وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ-

অর্থ : হজরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর নিকট দুজন লোকের (মর্যাদা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। তাদের একজন আবেদ (জ্ঞানহীন আমলকারী) এবং অপরজন আলেম (জ্ঞানী আমলকারী)। রাসূল (সা.) বললেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের উপর। অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ, ফেরেশতাগন, আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু, এমনকি পিপীলিকা তার গর্ত থেকে এবং মৎসকুল দোয়া করতে থাকে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ভাল (সত্য) কথা শিক্ষা দেয়।

(তিরমিযী, মিশকাত-হাদীস নং-২০৩)

ব্যাখ্যা : রাসূল (সা.) ও একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানসহ আমলকারী আর জ্ঞানহীন আমলকারীর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। অর্থাৎ ইসলামে জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা বা সওয়াব অন্য সকল কিছুর মর্যাদা বা সওয়াবের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। তাহলে এ হাদীসের ব্যাখ্যা থেকেও বের হয়ে আসে যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য : ১.৪

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اَحْيَاءِهَا —

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে ইবাদাত করার চাইতে উত্তম। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও বলা যায় কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য : ১.৫

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ-

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, একজন ফকীহ (ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি) শয়তানের জন্যে হাজারো আবেদ অপেক্ষা মারাত্মক।

(তিরমিযী, ইবনে-মাযাহ)

ব্যাখ্যা : এখানে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, একজন ফকীহ তথা ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান যার আছে তিনিই ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি। যে ধরনের ব্যাক্তিকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায় সে ধরনের ব্যাক্তি যেন তৈরী হতে না পারে সেটিই শয়তান সবচেয়ে বেশী চাইবে। শয়তানের সবচেয়ে বেশি আকাংখিত কাজটি যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে এটি বুঝা সহজ। তাই এ হাদীসখানির মাধ্যমেও রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দুরে রাখা। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

❑❑ এ সকল হাদীসের আলোকে নিশ্চয়তাসহ বলা যায় যে, হাদীস অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর এ হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের সাথে সঙ্গতিশীল। তাই এ হাদীস গুলো এ বিষয়ের সব চেয়ে শক্তিশালী হাদীস। আর এ জন্যে যে সকল হাদীসে শিরক সমন্ধে বক্তব্য আছে সে হাদীসগুলোকে এ হাদীসগুলোর সম্পূরক করে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি তা কোনভাবেই সম্ভব না হয় অর্থাৎ কোন হাদীসের বক্তব্য যদি এমন হয় যে তা ব্যাখ্যা করে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ ব্যতীত অন্যকোন সিদ্ধান্ত পৌঁছানো কোনভাবেই সম্ভব না হয় তবে সে হাদীস রাসূল (সা.) এর কথা নয় বলে ধরতে হবে।

তথ্যঃ ২.১

وَعَنْ عُبَيْدُ اللّٰه بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكْ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) الْكَبَائِرَ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰه وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَاَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِالْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَال شَاهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْبَرُ ظَنِّى اَنَّه شَاهَادَةُ الزُّوْرِ .

অর্থ ঃ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.) কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা কবীরা গুনাহ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ (কবীরা গুনাহ হলো) আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সর্বাপেক্ষা বড় ও শক্ত গুনাহ কোনটি তা কি তোমাদের বলবো? এরপর তিনি বললেন তা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া" (মুসলিম হাদীস নং ১৬৯)

তথ্য: ২.২

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَاءِرِ؟" قُلْنَا: بَلٰى يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ– قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ . وَحُقُوْقُ الْوِلَدَيْنِ" وَكَانَ مُتَّكِياً فَجَلَسَ . فَقَالَ : اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى : لَيْتَهُ سَكَتَ .

অর্থ : আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বললেন : সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হাঁ, হে রাসূল (সা.)। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথাগুলো

হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন! (বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুসসালেহীন-১৫৫০ নং হাদীস)

হাদীস দুখানির সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ২.১ নং হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) প্রথমে কবীরা গুনাহ হিসেবে তিনটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হলো- শিরক করা, অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করা এবং মা-বাবার নাফরমানী করা। অতঃপর হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) মিথ্যা কথা বলাকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বর্ণনাকারী সাহাবীর বেশ ধারণা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার কথা বলেছেন।

২.২ নং হাদীস খানিতে রাসূল (সা.) তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হল- শিরক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। প্রথম দুটি বিষয় রাসূল (সা.) হেলান দেয়া অবস্থায় বলছিলেন কিন্তু 'মিথ্যা কথা বলা' কথাটি বলার সময় তিনি সোজা হয়ো বসে নিয়েছিলেন। এবং কথাটি এতবার বলতেছিলন যে সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সা.) কথাটি বলা বন্ধ করুক এটি কামনা করছিলেন। এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে সহজে বুঝা যায় হাদীস খানিতে রাসূল (সা.) বিষয় তিনিটির মধ্যে মিথ্যা বলাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিন। অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে বলেছেন।

তাই হাদীস দু'খানির আলোকে সহজে বলা যায় যে, রাসূল (সা.) মিথ্যা বলাকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিরক করাও একটি মিথ্যা বিষয়। কারণ আল্লাহর কোন শরীক নাই। কিন্তু হাদীস দু'খানিতে রাসূল (সা.) শিরকের বিষয়টি আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছেন, তাই যে মিথ্যা কথাকে রাসূল (সা.) সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা শিরক ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথা হবে। পূর্বেই আমরা জেনেছি কুরআনের যেকোন বক্তব্য বা তথ্যের

বিপরীত কথা বা কাজ মিথ্যা । তাই যে ব্যক্তি কুরআন জানে না সে শিরক সহ বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা কথা মৃত্যু পর্যন্ত বলে যেতে থাকবে। তাই এ হাদীসখানির আলোকেও সহজে বলা যায় শিরক করা নয়। কুরআনের জ্ঞান না থাকাই সবচেয়ে বড় গুনাহ ।

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে হাদীস খানিতে যেহেতু শিরকের বিষয়টি প্রথমে বলা হয়েছে তাই শিরকের গুনাহ সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে। কথাটি সঠিক নয়। কারণ গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে যখন কয়েকটি বিষয় পরপর উল্লেখ করা হয় তখন প্রথম উল্লেখিত বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে এটি সব সময় সঠিক নয়। যেমন আল্লাহ হারাম বিষয়ের তালিকা দিতে যেয়ে বলেছেন-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : (হে নবী) তাদের বল, আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে এমন বিষয়কে শরীক করা যে ব্যাপারে কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলা যা সঠিক কিনা তা তোমরা জান না।

(৭, আরাফ : ৩৩)

ব্যাখ্যা : এখানে কয়েকটি হারাম (নিষিদ্ধ) বিষয়ের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ শিরককে, অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি ধরনের কাজের পর উল্লেখ করেছেন। গুনাহের কাজ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি ধরণের কাজের মধ্যে অনেক নিষিদ্ধ কাজ অন্তর্ভূক্ত। তালিকায় নাম প্রথমে থাকলেই সে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলে এ আয়াত অনুযায়ী শিরকের স্থান অন্য অনেক গুনাহের পরে হবে। এটিতো অবশ্যই হবে না।

তাই শুধু তালিকার স্থান বিবেচনা করে একটি বিষয়ের গুরুত্ব নির্ণয় করা ঠিক নয়। এ বিষয় সম্বন্ধে অন্য সকল তথ্য পর্যালোচনা করেই গুরুত্বের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। শিরকের ব্যাপারে

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে শিরককে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ বলার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ, এ তথ্যটি শতকরা একশতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক বুদ্ধির তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ্ এ কথা কোন ভাবেই বলা যায় না। আর কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ্ এ তথ্যটি শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়। কিন্তু অবাক কান্ড হলো প্রায় সব মুসলমান জানে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মূল জ্ঞানে এটিসহ অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিকে চরম অধঃপতিত জাতিতে পরিনত করা হয়েছে। কি পদ্ধতিতে এ ভুল ঢুকানো ও স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে খুব শীঘ্রই সে বিষয়ে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদের মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানোয় শুধু মুসলমানদের ক্ষতি হয়নি। সমগ্র মানব সভ্যতা আজ এর ফল ভোগ করছে। ঐ ঢুকিয়ে দেয়া মৌলিক ভুল তথ্যগুলো এতো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে যে তা সংস্কার করা ২-৪ জন ব্যাক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ মুসলমান যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তবেই তা সম্ভব হবে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারও ঈমানী দায়িত্ব এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা । মহান আল্লাহ আমাদের ও আপনাকে সে শক্তি ও সামর্থ দিক এ দোয়া করি।

পুস্তিকায় কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন। সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে–

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ্ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?